Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 75 – 83
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

নারীর লেখনী, নারীত্ব এবং বাংলাদেশের গল্প

রূপম প্রামাণিক
সহকারী অধ্যাপক, কুলতলি ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ
Email ID : pramanikrupam@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword

নারীত্ব, বাংলাদেশ, পুরুষতন্ত্র, মানবীবিদ্যাচর্চা, আন্দোলন, বুদ্ধিবৃত্তি, স্ত্রী, প্রতীক, দাসী।

Abstract

From an anthropological perspective, feminism never disenfranchises men. Rather, how the 'Oppressed' women, 'Abla' women are becoming equal to men is the relevant issue. Traversbing a long time from Begum Rokeya, some traces of the power that the women writers of Bangladesh have achieved today have been discussed in this article. On International Women's Day on March 8, 1992, a bold slogan was seen on the streets of Dhaka in numerous festoons—'My body is mine, other have nothing to say.' The shocking slogan is actually of strong confidence, self-assurance and that women have their own rights of both mind and body. It is a big shock to the male dominated society. Rokeya showed the duplicity of patriarchy. Jahanara Imam shows how women can use their bodies to take revenge against Pakistani Razakars. Neelima Ibrahim's 'Ramana Parke' story shows male hypocritical love. Both Laila Samad's 'Amurta Akanksha' and Razia Mahbub's 'Nirruttar' stories capture the distorted form of female youthful desire. Motijan's girls with Selina Hossain have stormed Bengali literature. Taslima's 'Matrittwa' story also satirizes the male-imposed solution of denying women their own needs. Razia Khan's 'Joy Jayanti' highlights the difference between women captive in their homes and working women. 'Ekti Idur O Koyekti Swarnamudra' tells the story of a simple woman turning violent in her quest to survive. 'Sarojinir Chobi' is actually a slap against the social norms imposed by patriarchy. The shame is not Sarojini's in this story. It is the society's. Specifically, feminism is not seen in the stories as such. But women wanted to express their stand for their own issues, standing up against the authority of men.

Discussion

> "অনেকে মনে করে যে, পুরুষের উপার্জিত ধন ভোগ করে বলিয়া নারী তাহার প্রভুত্ব সহ্য করে। কথাটা অনেক পরিমাণে ঠিক। বোধ হয়, স্ত্রীজাতি প্রথমে শারীরিক শ্রমে অক্ষম হইয়া পরের উপার্জিত ধন ভোগে বাধ্য হয় এবং সেইজন্য তাহাকে মস্তক নত করিতে হয়। কিন্তু এখন স্ত্রীজাতির মন পর্যন্ত দাস (enslaved) হওয়ায় দেখা যায়, ...আবার যিনি স্বয়ং উপার্জন না করিয়া প্রভুত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিনীকে বিবাহ করেন তিনিও ত স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করেন এবং স্ত্রী তাঁহার প্রভুত্বে আপত্তি করেন না। ইহার কারণ এই যে, বহুকাল

হইতে নারী-হৃদয়ের উচ্চ বৃত্তিগুলি অঙ্কুরে বিনষ্ট হওয়ায়, নারীর অন্তর, বাহির, মস্তিষ্ক, হৃদয় সবই 'দাসী' হইয়া পড়িয়াছে।"[১]

মানবীবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করলে বেগম রোকেয়ার এই ভাবনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীকে কখনোই পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিনী করে তোলা রোকেয়ার উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি চাইতেন 'অবরোধবাসিনী' নারী পুরুষের সমকক্ষ হয়ে উঠে সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাক। পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য বিদ্যার্জনের কোনো বিকল্প নেই বলে রোকেয়া মনে করতেন। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের অভাবেই স্ত্রীজাতি হীনবল হয়ে পড়েছে। তাই বিবাহ মহিলাদের একমাত্র কাম্য হতে পারে না। প্রসঙ্গত মনে রাখতে হবে নারীর 'দাসী' হওয়ার কাহিনি যেমন সামাজিক সত্য, তেমনি বাঁধভাঙার যে প্রয়াস রোকেয়া করেছিলেন; তা পরবর্তী লেখিকাদের মধ্যে বিস্তার হয়েছে। এই ধারায় বাংলাদেশের মহিলা লেখিকাদের গল্পে উঠে আসা নারীর অবস্থানকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব আমরা।

বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের পুরোধা বেগম রোকেয়ার বলিগর্ত গল্পে পুরুষতন্ত্রের দ্বিচারীতাকে ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখানো হয়েছে। কংগ্রেস সেবিকা কমলা, জাহেদা এবং বীণা একত্রে জাহেদার মামাবাড়ি বলিগর্তে যাওয়া স্থির করল। সম্মতিও মিলল মামা জাহেরদার ফরফরের থেকে। কিন্তু বাধ সাধল আসল সময়ে। নিজেদের আর্থিক কারন, রাস্তা জলমগ্নের দোহাই দিয়ে সেই যাত্রা সমাপ্ত হয় গুপ্তপুরে। আসলে দুজন হিন্দু রমনী জাহেদার সঙ্গে থাকায় খটখটে-ফরফরেদের গোঁড়ামি প্রকাশ্যে এসেছে। একদিকে তাঁরা মনে করেন ইসলাম অনুসারে পুরুষের চারটি বিয়ে করা আবশ্যক, অন্যদিকে নিজের বিধবা বোনের দ্বিতীয় বিয়ে দিতে চান না হিন্দুরাস্ট্রে থাকার অজুহাতে। আর্থিক দুর্গতি যাই হোক খটখটে সাহেব চতুর্থ বিয়ের আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাস্তায় মাতলামি করায় কেউ আর বৃদ্ধ জমিদারকে কন্যা দান করতে চায়নি। জমিদারের সব গেছে, শুধু অহংটাই আছে। তিন বউ তিনটি স্যুট দখল করে থাকে বটে, কিন্তু ছাগল-ভেড়ার সঙ্গেই তাদের সহবস্থান। তিনি উচ্চ হারে সুদ গ্রহন করেন, কারন শাস্ত্রে সুদ নিষিদ্ধ। ধর্মের বিনিময়ে সুদ নিলে একটু তো বেশি নিতেই হয়। তিনি অবরোধপ্রথার বিরোধী, তাই স্ত্রীদের শখ মেটানোর জন্য শহর ঘোরাতে নিয়ে যান। যদিও গাড়ি ছিল বোম্বাই চাদরে ঢাকা। তারপর মিঃ খটখটের নিদান—

"দেখ তোমরা মোটরে বেড়াইতে গিয়া অসংখ্য পুরুষের মুখ দেখিয়াছ সেজন্য এখনই আমার সম্মুখে তওবা (অনুতাপ) কর এবং প্রতিজ্ঞা কর জীবনে আর কখনও মোটরে উঠিতে চাহিবে না।"[২]

বাংলাদেশের প্রবাদপ্রতীম শিশুসাহিত্যিক এবং অনুবাদক জাহানারা ইমামের অন্যতম একটি গ্রন্থ 'একাত্তরের দিনগুলি'। মৌলবাদ-বিরোধী এবং সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী আন্দোলনের মুখ এই লেখিকার লেখনীতে ধরা পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি। তাঁর অস্ত্র গল্পটি নারীর নিজেকে অস্ত্র করে তোলার প্রতীকি ব্যঞ্জনায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। বেতলডিহি গ্রাম এতদিন মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটি বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু সেই গ্রামেও মিলিটারি-রাজাকারদের আনাগোনা শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে গ্রামের মুরগি, লাউ, বেগুন, কলাও তারা বিনা প্রশ্নে লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা মফিজ, রশীদ, মনির ফিরে দেখে বাড়িতে কেউ নেই। বাড়ির পেছনের জল থেকে উঠে আসে কালার মা আর ছবিরণ। তারা জানায় উর্দুভাষী সেনারা এসেছিল, তাই জলে নেমে ডালের আড়ালে আব্রু বাঁচায় তারা। আবার যুদ্ধে যায় মফিজরা। তাদের কাছে অস্ত্র চায় ছবিরণ। কিন্তু নারীর হাতে অস্ত্র দেখে শারীরিক নিপীড়ন হতে পারে ভেবে মফিজরা এড়িয়ে যায়। আবারও আসে রাজাকাররা। কালার মায়ের অনুপস্থিতিতে ধর্ষিতা হয় ছবিরণ।

"অস্ত্র! একখান অস্ত্র আমার চাই-ই! ভাইজান, তোমারে মুখ ফুইটা কইতে পারি নাই, মেলেটারি মারণের জইন্য অস্ত্র চাই নাই, মেলেটেরিগ হাত থনে নিজের ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য অস্ত্র চাইছিলাম। অগর হাতে পড়নের আগে নিজের জানটা তো লইতে পারতাম রাইফেল দিয়া!"[৩]

প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ছবিরণ খুঁজে পায় তার অস্ত্র। তার দুর্বলতাই তার অস্ত্র হয়ে ওঠে। নিজের শরীরকে বাজি রেখে মিলিটারি-রাজাকারদের আমন্ত্রণ জানায় ছবিরণ। পরিকল্পনায় থাকে ভাইদের দ্বারা ধর্ষকদের হত্যা।

> "ভাইরা রাইফেল, গেরেনেড দিয়া যুদ্ধ কইরা খানসেনা মারতাছে, আমিও আমার অস্ত্র দিয়া যুদ্ধ কইরা ওই হারামীগো মারুম।"[৪]

নারী শুধু আব্রু রক্ষা করবে না, সে আব্রুর বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতা আনবে। যে নারীকে সমাজ শরীর সর্বস্ব দেখতে ইচ্ছুক, সেই নারীই শরীরের বিনিময়ে নতুন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম নারীর স্বাধীনতার জন্য আজীবন লড়াই করেছেন। প্রাসঙ্গিকভাবে সমাজকর্মী হিসাবেও তিনি সুবিদিত। পুরুষের সম্পত্তিপ্রীতি বনাম নারীর হৃদয়বত্তার গল্প রমনা পার্কে। আত্মকথনের ভঙ্গীতে গল্পটি লেখা। কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনে স্বামীর সঙ্গে ঘুরতে যাওয়ার বাসনা আজ বাস্তবায়িত হতে চলেছে। তাই তরুনী হৃদয়ের তরঙ্গাঘাত উপলব্ধি করছেন কথক মাঝ বয়সে এসে। ভালো শাড়ি পরা বা স্নো-পাউডার মাখা হল না কন্যাদের আড়াল করার জন্য। কিন্তু বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে কর্তার মনে পড়ল আয়রন সেফের চাবির কথা, যা নারী হৃদয়ের পক্ষে অবজ্ঞাই বটে। রমনা পার্কে পৌঁছে কথকের মন লজ্জামিশ্রিত আনন্দে ভরে উঠল। কথক আজ আর সাংসারিক গৃহবধূ নন, তিনি হয়ে ওঠেন দয়িতের প্রিয়া। নির্জনতার খোঁজ করতে গিয়ে তাদের মনে পড়ে যৌবনে কাটিয়ে আসা বটানিকাল গার্ডেন বা ডায়মন্ড হারবার নদীতীরে কাটিয়ে আসা স্বপ্নময় সুখের দিনগুলি। মীনা আপার মাথায় লাল গোলাপ দেখে দয়িতার মনে হয়, দিন তাহলে এখনও ফুরিয়ে যায়নি। যুবক-যুবতীদের প্রেমময় উল্লাস, চুম্বনের আকুতি— সমগ্র পরিবেশেই যেন প্রিয়মিলনের বার্তা। অথচ দীর্ঘদিনের অভ্যাসবসত আজ বাড়িফেরার তাড়া। প্রায়ই রমনা পার্কে আসার বাসনা নিয়ে যখন তারা গাড়িতে উঠেছেন কথক দেখেন কর্তার পকেটে হাত।

> "বললাম, কি হলো? হেসে বললেন—না, চাবিটা ঠিকই আছে।"[৫]

এখানেই দিনের সমস্ত আয়োজন বৃথা হয়ে যায়, বৃথা হয়ে যায় আবার রমনা পার্কে আসার পরিকল্পনা। এত সুন্দর সময় অতিবাহিত করে যদি চাবির খোঁজই প্রাধান্য পায়, তবে রমনা পার্কে ভ্রমণ লোকদেখানো হয়ে যায়; ভালোবাসা আর দ্বায়িত্ব সমান্তরাল পথে চলতে শুরু করে। ভদ্রপ্রেমকে সোনার পাথরবাটি বলে প্রতীত হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী লায়লা সামাদ দেশভাগের পর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষকতার চাকরির পাশাপাশি বেতার ও সাংবাদিকতার কাজে যুক্ত ছিলেন। শিশুসাহিত্যিক এবং প্রতিবাদী লেখিকা হিসাবে তিনি আজও স্মরণীয়। সুরমার অতৃপ্ত যৌবন এবং সম্মান চাহিদার গল্প অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা। গল্পের শুরুতে আছে—

> "নিজের দুঃখে কোনদিন কাঁদতে শেখেনি সুরমা। না শিখেছে সংসারে কারও কাছে অভিযোগ বা দাবি জানাতে।"[৬]

তাই গল্পের শেষে দেখতে পাই নিজের চাহিদার জন্য সে কারো কাছে দাবি করেনি-দুঃখ করেনি, বরং নববধূর শাড়ি-গয়না চুরি করে নববধূরূপে সজ্জিতা হয়ে অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছে। ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে বড় হওয়া সেলিম এবং সুরমার মধ্যে যৌবনের আভাষ যখন পূর্ণ, তখনই সেলিমের মা জোবেদা বেগম সেলিমকে শহরে পাঠিয়ে দেয় এবং সুরমার সঙ্গে শহর আলির বিয়ে দেয়। যে সেলিমের সঙ্গে তার সবচেয়ে বেশি সখ্যতা ছিল, সুরমার বিয়েতে যে সেলিম উন্মাদপ্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিল, সে আজ শহুরে কন্যা বিয়ে করে আনছে। একদিকে যুবতী বিধবা সুরমা দাদীর খোঁটায় জর্জ্জরিত, অন্যদিকে নববধূর কাছে সেলিম তার পরিচয় দেয় 'আমার দুখিঃনী বোন' বলে। এ কি প্রবোধ, না কি দ্বিচারিতা? অপমান মাথায় নিয়ে সুরমা চলে যায় লোকচক্ষুর আড়ালে। সারাদিনের ক্লান্তির পর সেলিমের ঘরের জানালায় উঁকি মেরে সুরমা লক্ষ করে নববধূর লজ্জাবনত আনন্দের মুখশ্রী। জেগে ওঠে তার অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা, মাঝরাতে নববধূর শাড়ি-গয়না চুরি করে নববধূর রূপ ধরে সে। একদিকে সুরমার অনুভূতির জগৎ, আনন্দের জগৎ। অন্যদিকে তার বাস্তবের জগৎ, সত্যের জগৎ। সারাদিনের বাস্তবের জগৎকে পেছনে ফেলে বধূ হওয়ার তীব্র বাসনা বুকে নিয়ে যুবতী মনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলবার বাসনায় সুরমা যেন সংযম, নীতিবোধ সবকিছুকে তুচ্ছ করেছে আজ। পাঠকের মনে হতে পারে 'দুধের স্বাদ ঘোলে' মেটানোর এই পক্রিয়া আসলে মানসিক বিকৃতির লক্ষন। কিন্তু একটু বিচার করলে দেখা যাবে 'চোখের বালি'তে বিনোদিনীর সমস্যার সঙ্গে সুরমার সমস্যার কিন্তু কোনো পার্থক্য নেই। বাল্য বিধবার প্রতি পুরুষতান্ত্রিক সমাজের এই অবিচার বহু পুরানো। নারী হয়েও জোবেদা সেই পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি।

স্বাভাবিক প্রেমের সম্পর্ককে জোবেদারা যদি সমাজের পরোয়া না করে স্বভাবিক রূপ দিত, তাহলে সমাজের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষাগুলি হ্রাস পেত।

নিরুত্তর গল্পটিকে অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা গল্পের পরবর্তী অংশ বলে মনে হতে পারে। শুধু সুরমার স্থান দখল করেছে খুশি। সুরমা নববধূর শাড়ি-গয়নায় সজ্জিত হয়ে বিবাহের আশ্লেষ অনুভব করেছিল আর খুশি যৌবনের তাড়নায় স্বামী-স্ত্রীর যৌনালাপ শুনে তাদের রতিক্রিয়া দেখতে গিয়ে ধরা পড়ে। মাতৃহীন খুশি বিমাতার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ঘরছাড়া হয়। বাড়ির সবার বাধা সত্ত্বেও বেগম সাহেবা খুশিকে পরম মমতায় আশ্রয় দেয়। বাড়ির সব কাজের বিনিময়ে দুবেলা খেতে পায় খুশি। বাড়ির বড় ছেলের বিয়ে হলে নব দম্পতির রাত্রিকালীন আলাপ খুশির মধ্যে জানার আকুলতা তৈরি করে। আসলে এই আকুলতা খুশির নয়, বরং ২৫ বর্ষীয় অবিবাহিত উদ্ভিন্নযৌবনা নারীর আকুলতা, নিজের যৌবনকে যাচাইয়ের আকুলতা। খুশিকে বাড়ির সবাই দেখেছে দুখিঃনীরূপে, সবাই দেখেছে বৃদ্ধ চাকর করিম চাচাকে হারিয়ে দেওয়া বিশ্বস্ততার প্রতিমারূপে। কিন্তু তার যৌবনের চাহিদার খোঁজ কেউ রাখেনি। হয়ত রেখেছিল, কিন্তু শুধু দুবেলা খেতে দিয়ে এমন কাজের লোক কজনইবা পায়? তাই সুরমার মত খুশির যৌবনও দিশেহারা হয়ে বিকৃত পথ বেছে নিয়েছে। মোল্লাতন্ত্র নারীকে ভোগ্যবস্তু বলে মনে করে। অন্যদিকে নারীও দীর্ঘদিনের দাসীসুলভ মানসিকতায় মননে গড়ে ফেলেছে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা। কারণ পুরুষ নারীর সতীত্ব বা কুমারীত্ব নিয়ে যতখানি জোর দেয়, তার শরীর নিয়ে ততটা দেয় না।

'শক্ত মেয়েমানুষ' হয়ে ওঠার গল্প সেলিনা হোসেনের মতিজানের মেয়েরা। সেলিনা হোসেন বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক। শিক্ষাবিদ সেলিনা হোসেন একাধারে বাংলাদেশের বাংলা একাডেমির পরিচালক এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন, অন্যধারে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ছিলেন। তাই নারীর অধিকার নিয়ে তিনি সদা সচেতন। একই সঙ্গে দেশভাগ, বাস্তহারা মানুষের যন্ত্রনা এবং সর্বোপরি ছিটমহল সমস্যা তাঁর কলমে জীবন্ত রূপ লাভ করেছে। মতিজান বিবাহের পর উপলব্ধি করল তার শাশুড়ি গুলনুর খুব শক্ত মানুষ। এতটাই শক্ত যে, তার স্বামী আবুলও মায়ের কাছে অসহায়। সেজন্য বিকৃত পথে নিজের স্বাদ-আহ্লাদ মেটাতে আবুল বেশ্যা বাড়িতে রাত কাটায়। বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যেই লম্পট স্বামী নিয়ে মতিজানের ঘর করার স্বপ্ন উবে যায়—ও বিধবা হতে চায়। আমাদের মনে পড়বে আশাপূর্ণা দেবীর ছিন্নমস্তা গল্পের কথা, যেখানে সন্তানের মৃত্যু কামনা করেছিলেন মা। আর এই গল্পে স্বামীর মৃত্যুকামনা করে স্ত্রী। এরপর শুরু হয় বিয়েতে যৌতুকস্বরূপ আংটি এবং সাইকেল না পাওয়ার গঞ্জনা। প্রথম-প্রথম অপরাধবোধে পালাত মতিজান। কিন্তু সে অনুভব করে, দোষ তো তার নয়। সে স্বাধীন ভাবে সমবায়ে কাজ করে বাঁচতে চেয়েছিল। আজ আর তা সম্ভব নয়, তাই—

> "ও শক্ত মেয়েমানুষ হতে চায়।"[৭]

শক্ত মেয়ে মানুষ বলে পরিচিত শাশুড়ি গুলনুরের সাথে তার যুদ্ধ। মতিজান উপেক্ষা করতে থাকে গুলনুরকে। গুলনুরের প্রথম পরাজয় ঘটে আবুলের জন্য রাখা মাছ-ভাত মতিজান ছিনিয়ে খেলে। এবার গুলনুর বাঁজা মেয়েমানুষ বলে মতিজানকে দাগিয়ে দিতে চায়। শিশ্ন ও যোনির দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য মুসলমান সমাজে আজও বিদ্যমান। সঠিক যৌনশিক্ষার অভাব নারীর চাহিদা এবং সন্তানধারণের ক্ষমতাকে এক করে দেখে। গুলনুরের এই অবস্থানের বিপরীতে দাঁড়িয়েছে মতিজান। আবুলের কাছে সন্তান চেয়ে ব্যর্থ হলে মতিজান আত্মসমর্পন করে লোকমানের কাছে। কন্যাসন্তানের জন্ম দেয় মতিজান। গুলনুরের এটি দ্বিতীয় পরাজয়। কিন্তু পুত্রসন্তান না জন্মানোয় বংশরক্ষা হয় না। মতিজান বলে—

> "আপনার আবার পুরুষ ছাওয়ালের শখ ক্যানহে? আপনার ছেলে তো আপনাকে পুছে না।"[৮]

মেয়েকে নিয়ে মতিজানের আনন্দ দেখে মারমুখী হিংস্র হয়ে ওঠে গুলনুর। সমাজের উপেক্ষাকে উপেক্ষা করে—

> "মতিজান ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে বলে আমি পারলে শত মেয়ের জন্ম দিতাম।"[৯]

লোকমানকে সঙ্গী করে পরের বছর আবার এক মেয়ের জন্ম দেয় মতিজান। আবার মেয়েছেলে জন্ম দেওয়ায় মতিজানের খাবার নিষিদ্ধ হয় বাড়িতে। বংশের বাতি জ্বালানোর জন্য ছেলের আবার বিয়ের ঘোষনা করে আবুল। হেসে উঠে মতিজান জানায়—

"থুঃ আপনের ছাওয়ালের আশায় থ্যাকলে হামি এই মাইয়া দুইডাও পেত্যাম না।"[১০]

নারীর স্বরে পুরুষতন্ত্রের আদর্শ উদাহরন গুলনুর। 'শক্ত মেয়ে মানুষে'র ছায়ায় সে তার পুত্র আবুলকেও ছাপিয়ে গেছে। বংশের বাতি পাওয়ার কামনা (পুরুষতন্ত্র) যে আসলে হেরে যাওয়া গুলনুরের মতিজানের থেকে মুক্তি পাওয়ার কামনা, তা পাঠক সহজেই বুঝে নেন। অন্যদিকে প্রতিস্পর্ধায় গুলনুরকে ছাপিয়ে যাওয়া মতিজান হয়ে ওঠে বিদ্রোহের প্রতীক। পুরুষতন্ত্র বিশুদ্ধ মাতৃত্বে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে বিবাহিত মাতৃত্বে বা আইনত স্বামীর দ্বারা গর্ভসঞ্চারকৃত মাতৃত্বে। নারীর শরীরে শুধুমাত্র তারই অধিকার আছে। সে কার সন্তানকে জন্ম দেবে— এ একেবারেই তার নিজস্ব সিদ্ধান্ত। আর এখানেই মতিজান উজ্জ্বল।

রাজিয়া খান বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবি মহলে পরিচিত নাম। একুশে পদকপ্রাপ্ত এই অধ্যাপিকা আজীবন মঞ্চাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সামাজিক, রাজনৈতিক বাধাগুলি অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন।মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি 'বটতলার উপন্যাস' লিখে তিনি লেখক মহলে পরিচিতি অর্জন করেন। জয় জয়ন্তী গল্পে তিনি নারীর আত্মমর্যাদার প্রশ্নটিকে আরও একবার তুলে ধরেন। শিক্ষিতা, রুচিসম্মত নীলাকে গৃহবধূ করে বাড়িতে এনেছিল আমানের পরিবার। কিন্তু নীলার সেই রুচির, চাহিদার মর্যাদা দিতে পারেনি তারা। অন্যদিকে নীলাকে হারিয়ে আমান বুঝতে পারে রুচির সঠিক মাত্রা। তার কাছে নীলা আরও গুরুত্ব পায় যখন বর্তমান স্ত্রী সঙ্গীতা শাস্ত্রীয় সংগীত শোনার বদলে ননদের সঙ্গে সিনেমা দেখার আবদার জানায়। নীলা আজও তার কাছে কতখানি প্রাসঙ্গিক তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মঞ্চে নীলার গান শেষ হওয়ার পর। আমানের চোখে আসা জল সঙ্গীতাকে ক্রুদ্ধ করে তোলে আর এখানেই নীলার সঙ্গে সঙ্গীতা একাকার হয়ে যায়। পুরুষতন্ত্র নারীকে রুচি-অরুচির বিষয় বানিয়েছে।

> "পিতৃতন্ত্রের একটি সুন্দর ষড়যন্ত্র হচ্ছে নারীদের এক শ্রেণীকে লাগিয়ে রাখা আরেক শ্রেণীর বিরুদ্ধে; বেশ্যার বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা সতীকে, কর্মজীবী নারীর বিরুদ্ধে লাগিয়ে রাখা গৃহিণীকে।"[১১]

আমানের পরিবার পরিজনের চাহিদার উল্টোদিকে নীলার অবস্থান। নীলা ঘর ছেড়েছিল নিজের ভালোবাসাকে মর্যাদা দিতে। আর সঙ্গীতা নিজের ভালোবাসার মর্যাদা চায় আমানের কাছে। নারীর স্বকীয় মনস্তাত্ত্বিক গঠন অনুযায়ী ভালোবাসা ভাগের কোনো স্থান নেই। তাই নীলার প্রতি আমানের মনে আজও নরম স্থান আছে দেখেই সঙ্গীতা ক্রুদ্ধ হয়। বিয়ের এক পক্ষকাল যেতে না যেতেই নীলা সংগীত সাধনায় মত্ত হয়ে ওঠে। তার চাই নিবিড় নিঃশব্দ রেওয়াজের পরিবেশ। অন্যদিকে আমানের একান্নবর্তী পরিবারের পরিবেশ তার পরিপন্থী। সারাদিনের হইচই নীলাকে অবসন্ন করে তোলে। সে চায় একান্ত সঙ্গীত অনুশীলন। ভোরের স্নিগ্ধ পরিবেশে নীলা যখন সংগীতে মত্ত বাড়ির সবাই ঘুমের ব্যাঘাতে অসন্তুষ্ট হয়। এমনই নানান সমস্যায় দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে নীলা শ্বশুর বাড়ি ছাড়ে। আমানের শত ক্ষমা প্রার্থনাতেও নীলা আর ফিরল না। আজ আমান সঙ্গীতাকে নিয়ে এসেছে নীলার সঙ্গীত শুনতে। শুধুমাত্র সংগীতে নয় নীলার সৌন্দর্যেও আমান আগের মতই মুগ্ধ। আফসোসে আমানের চোখে জল চলে এলে সঙ্গীতা নারীত্বের দাবিতে, মর্যাদার দাবিতে ক্ষুন্ন হয়। আর এখানেই দুই নারীর নিজস্ব চাহিদায় আমান হেয় প্রতিপন্ন হয় পাঠকের কাছে।

তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশের একজন আলোড়ন সৃষ্টিকারী লেখিকা। পেশায় চিকিৎসক হলেও লেখালেখির জগতে কবিতা দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। একটি সাপ্তাহিকে পুরুষতন্ত্র বিরোধী কলাম লিখে তিনি বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসেন। পরবর্তীকালে উপন্যাস 'লজ্জা'র কারণে তিনি মৌলবাদীদের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং প্রবাসী হয়ে ভারতে চলে আসেন। আরও পরে পশ্চিমবঙ্গে মৌলবাদীদের কোপে পড়ে তিনি প্রথমে দিল্লি, পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে বাধ্য হন। 'নির্বাচিত কলাম' তাঁর সর্বাধিক আলোচিত গ্রন্থ। বরাবরই পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তসলিমার কলম ঝলসে উঠেছে। মাতৃত্ব গল্পটি তারই একটি রূপ। পুরুষতন্ত্র নারীকে বরাবরই সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বলে মনে করে। তাই সন্তান না হলে সমস্ত দোষের ভাগীদার নারীকেই হতে হয়। পুরুষ যেন কোনভাবেই দোষী নয়। সন্তান উৎপাদন বা অনুৎপাদনের সমস্ত শারীরিক সুবিধা বা অসুবিধা নারীকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে বলে পুরুষতন্ত্র বিশ্বাস করে। তাই

গল্পে দম্পতির সন্তান না হলে দোষ গিয়ে পড়ে গৃহবধূর উপরেই। এমনকি ডাক্তারি পরীক্ষায় স্বামীর ত্রুটি ধরা পড়লে স্বামী মানতে চায় না। সে বলে—

> "আমার বয়সের লোকেরা পাঁচ মিনিটেই ফুরিয়ে যায়। সেখানে আমি টিকে থাকি তিরিস চল্লিশ মিনিট। আর বলে কিনা আমার ক্ষমতা নেই।"[১২]

পুরুষতন্ত্র বোঝেনা যৌন ক্ষমতা আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা এক নয়। শুধু তাই নয় পুরুষতন্ত্রের রূপ গৃহবধূটি দেখতে পায় তার শাশুড়ির মধ্যে। পাড়া-প্রতিবেশীর কাছে তাকে হেয় করে শাশুড়ি। ধাপে ধাপে ছোট হতে হতে অমর্যাদায় নিজেকে কুঁকড়ে ফেলে সে। এমনকি নিজের বাপের বাড়ির লোকের কাছেও পুরুষতন্ত্রের আরেক রূপ দেখে সে। সতীনের ঘর করতে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয় বলে জানায় তার বাবা মা—

> "মেয়েদের জীবনে স্বামীই হল সব। সতীনের ঘর কর মা। এতে কোনও লজ্জা নেই। কত মেয়েরা সতীন নিয়ে থাকছে না! আর তোমারি দোষে তো লতিফ বিয়ে করছে। অন্যায় তো কিছু করছে না।"[১৩]

হঠাৎ এক মেদিনীপুরী পীরের খোঁজ মেলে। তার কাছে গিয়ে বাঁজা মেয়েরা নাকি সন্তান ধারণ করছে। বিশ্বাস হয় না গৃহবধূর। স্বামী লতিফকে সে আবারো ডাক্তারের কাছে যেতে অনুরোধ করে বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে। কিন্তু পুরুষতন্ত্র যুক্তির বদলে বিশ্বাসকে বেশি গুরুত্ব দেয়। ফলত পীরের কাছে যাওয়াই ভবিতব্য হয়ে ওঠে গৃহবধূর।আর সন্তান দেওয়ার নামে সেই পীরের কাছে গোপনগৃহে ধর্ষিতা হয় গৃহবধূটি। লজ্জায়, ঘৃণায় স্বামীর দিকে তার ছুঁড়ে দেয়া থুতু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। সন্তান পাওয়ার আনন্দে স্বামী লতিফ যখন মগ্ন, তখন নিজের নারীত্বের বলিদান দিতে বাধ্য হয় গৃহবধূটি। আর এখানেই হাজার বছরের পুরুষতন্ত্রকে শ্লেষে, বিদ্বেষে ভরিয়ে দেন লেখিকা। অমর্যাদা নারীকে প্রতিবাদিনী করে তোলে। সতীত্বের কারণে নয় বরং নারীত্বের মৃত্যুর কারণেই গৃহবধূর চোখে স্বামী হীন প্রতিপন্ন হয়।

বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা শিশু-সাহিত্যিক জুবাইদা গুলশান আরা। ছোটদের জন্য তিনি টেলিভিশনে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান পরিকল্পনা এবং পরিবেশন করেছেন। তাঁর শৈশব কাটে কলকাতায়, দার্জিলিংয়ে, কার্শিয়াং এবং কালিম্পং-এ। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস হল 'বিষাদনগরে যাত্রা' এবং 'ধল পহরের আলো'। একুশে পদকপ্রাপ্ত এই সাহিত্যিক বাংলাদেশ শিশু একাডেমির চেয়ারম্যান ছিলেন। প্রথম জীবনে স্কুলে শিক্ষকতা করলেও পরবর্তীকালে তিনি ইডেন মহিলা মহাবিদ্যালয়ে প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। তাঁর একটি বিখ্যাত গল্প একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা। এই গল্পে লেখিকা ইঁদুর এবং মানুষের রূপকে সমাজের স্তরবিন্যাস এবং সময় চেতনাকে তুলে ধরেছেন। নিয়তি এবং কর্মফলের মধ্যে পাঠক কোনটাকে গ্রহণ করবেন আর কোনটাকেই বা ত্যাগ করবেন, গল্পে এই প্রশ্নটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। গল্পে শরবতীর হাতে মিঠু মস্তানের মৃত্যু কোনো আকস্মিক ঘটনা নয় বা বাবাকে-পরিবারকে বাঁচাতে শরবতী মিঠুকে খুন করেনি বরং নিজের আত্মসম্মান রক্ষার তাগিদে, সমাজের কলঙ্কমুক্তির তাগিদে তার হাত দুটো মিঠুর গলায় সাপের মতো চেপে বসে। ঘটনাক্রম হয়তো বলবে মিঠু না খুন হলে জলিল মিঞা খুন হত। তাই বাবাকে বাঁচাতেই শরবতী চালাকির দ্বারা, বুদ্ধিমত্তার দ্বারা মিঠুকে জব্দ করে। কিন্তু আমরা যদি গল্পের পারম্পর্য অনুসরণ করি তাহলে বুঝতে পারব মিঠুর মৃত্যু শুধুমাত্র স্বর্ণমুদ্রার কারণে হয়নি বরং এলাকায় মিঠুর দাপটে মহিলাদের সম্মানহানি এবং গুন্ডামির হয়তো প্রতিফলন। গল্পে আমরা দেখেছি কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে শহরে এসে জলিল মিঞা নিজের স্থান শক্তপোক্ত করে। কিন্তু কয়েক বছরে লতার মত বেড়ে ওঠা শরবতী মিঠুদের বাজে নজরে পড়েছে।

> "উপরন্তু এখানে ইস্কুলে যাওয়ার সময় গায়ে এসে পড়ে শিসের টুকরো, অশ্লীল চাউনি। কানে আসে, হিসেব-নিকেশ হচ্ছে কার মেয়ে যাচ্ছে কোন এলাকার সম্পত্তি সে।"[১৪]

প্রথম প্রথম শরবতী বুঝতে পারত না, তার কি করনীয়। কিন্তু এখন সে সইয়ে নিয়েছে নিজেকে।

> "তীর বেগে হোন্ডা চালিয়ে পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় যখন স্পিড কমিয়ে লোকটা বলে— যাও, যাও... কেউ তোমায় ডিসটার্ব করবে না। তখন উপযাচকের অনাহত করুণায় গা রি রি করে ওঠে।"[১৫]

শরবতী এখন তার বাবার মতই সবকিছুকে মিষ্টি মধুর দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। বিয়েতে তার অনীহা। বাবাকে ছেড়ে যেতে চায় না সে। এলাকায় মিঠু মস্তান আর তার সাগরেদদের দাপটে কম বয়সী সব মেয়েরই একই অবস্থা। তারা না পারে প্রতিবাদে মুখর হতে, না পারে মস্তানদের সঙ্গে মিষ্টি হেসে কথা বলতে। সবার মতই তারাও শিখে গেছে এড়িয়ে চলে কীভাবে নিজেদের জীবনযাত্রা নামে মাত্র স্বাভাবিক রাখা যায়। এলাকার এমন পরিস্থিতি ছিল না, যখন প্রথম জলিল মিঞা এই শহরে আসে। চিরকুমার চাচার এই বাড়ি ঘর পেয়েছে সে। কিন্তু ব্যবসার খাতিরে সমাজের নানান মানুষের সঙ্গে তাকে যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। তাই তার জটিল সব বন্ধুত্বে খুশি নয় শরাবতী। জলিল মিয়া বলে ওঠে,

> "আমি কি এমুন আছিলাম? আমারে হগলে বানাইছে।"[১৬]

মিঠু মস্তানের তোলার টাকা না দিতে চেয়ে প্রথম ধাক্কা খায় জলিল মিয়া। মিঠু তার দোকান ভাঙচুর করে। সেই থেকে মিঠুকে সমঝে চলে জলিল মিয়া। পুরানো বাড়ি ভেঙে খোঁড়াখুঁড়ির সময় গর্ত থেকে উঠে আসে শত শত ইঁদুর সঙ্গে কয়েকটি প্রাচীন মুদ্রা। এক জোড়া কানফুল। জলিল মিঞা বিষয়ী মানুষ, দেরি না করে সেগুলো তাড়াতাড়ি সরিয়ে ফেলে। কিন্তু খবর পৌঁছে যায় মিঠুর কাছে। যথারীতি এসে হাজির মিঠু। জলিল এবং শরাবতী দুজনেই বুঝে ফেলে মিঠুর আসার কারণ। চালাকি করে জলিল মিঠুকে বলে ইঁদুরের সঙ্গে পেরে ওঠা কঠিন। বিশেষত একটি ইঁদুর বারে বারে গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। মিঠু প্রথমে ইঁদুরটাকে মারার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, এমনকি ইঁদুরটাকে মারার চেষ্টাকে সে বেশ খেলা বলে মনে করতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টার পর ফল না মিললে বিষয় পরিবর্তন করে মিঠু সরাসরি স্বর্ণ মুদ্রার প্রসঙ্গে আসে। জলিল মিয়া মানতে না চাইলে দুজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। এমতাবস্থায় শরাবতী মিথ্যা সাপের ভয় দেখিয়ে মিঠুর মনসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায় এবং নিজের কোমল বাহু দুটি দিয়ে জড়িয়ে ধরে মিঠুর গলা। শ্বাস বন্ধ হলে তারপর সেই হাত থেকে মিঠুর গলার মুক্তি হয়। পরের দিন নদীবক্ষে কচুরিপানার মধ্যে একটি দেহ ভাসতে দেখে মদন মাঝি। ভাসমান দেহের উপরে বসে আছে দুটি ইঁদুর। তারা চোখ গুলো খুবলে খেয়েছে, আঙুলও প্রায় নেই। তাড়াতাড়ি সরে যায় মদন মাঝি আর ফজল আলীকে বলে—

> "দুনিয়াটা এই রকমই কঠিন। কহনও আমরা ইন্দুরগুলারে মাইরা শ্যাষ করি, আবার কহনও ইরগুলা আমাগো পাইলে ছাড়ে না। বুঝলি? এইডারে কয় মানবজেবন?"[১৭]

যে শরাবতী এবং জলিল মিঞা এক সময় মিঠুর কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছিল, সেই মিঠুর দেহ আজ ইঁদুরের কাছে অসহায়। সমাজের এই স্তরবিন্যাসের অদল বদল শুধুমাত্র সময়ের খেলা নয়, তার পেছনে কাজ করে মানুষের চাওয়া পাওয়ার চেষ্টা এবং পাওয়া জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকার মানসিকতা।

হোসনে আরা শাহেদ বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা কলাম লেখিকা। বিবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে নিয়মিত সংবাদপত্রে তাঁর লেখা প্রকাশ হত। ছোটগল্প লিখেছেন। রম্য রচনায় তিনি বেশ দক্ষ। বহু পাঠকপ্রিয় প্রবন্ধের রচয়িতা তিনি। পুরাতন ঢাকার শেরবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবে কর্মজীবন শেষ করেন হোসনে আরা শাহেদ। তাঁর লেখা একটি জনপ্রিয় গল্প সরোজিনীর ছবি। হাজার হাজার বছর ধরে পুরুষতন্ত্রের তৈরি করা নিপীড়িত নারীর ছবি সরোজিনী। পড়াশোনা না জেনেও সে একটি মহিলা স্কুলে সমস্ত কাজে পারদর্শিতা দেখিয়ে সবার মন জয় করে এসেছে প্রায় পঞ্চাশ বছর। এমনকি; ঘড়ি তিনি দেখতে জানেন না, কিন্তু কাঁটার অবস্থান বুঝে সময় মত ঘন্টা দিয়ে দেন। কিন্তু আজ জীবনের প্রায় শেষ লগ্নে এসে মানসিক অস্থিরতায় পড়ে সরোজিনী। যে চেয়ারকে সে নিজের জীবিকার আকর বলে মনেকরে, যে চেয়ারকে সে সমীহ করে; সেই চেয়ারেই তাকে বসতে হল ছবি তোলার জন্য। এ যে ভয়ংকর অপরাধ। দারিদ্র্যের কারণে পড়াশোনা শিখতে পারেননি। কিন্তু হিসাব তার মুখে মুখেই। সময় বদলালে টিপছাপের বদলে সই করার নিদান এল। যথারীতি তিনি শিখলেন সই, কিন্তু পড়তে পারলেন না। আসলে নাম লেখা তাঁর কাছে আঁকার মতোই নকল করা। জীবনের বিরুদ্ধে তাঁর নালিশ নেই। তিনি বলেন—

> "আছি সুক্কেই। আমার ছাইতে বালা অবস্থায় আছে আরও বহুতজন, হেইডা বুজি—বুজবার পারি। কিন্তুক আমার থনে দুঃকি যারা, হ্যারাই তো বেশি।"[১৮]

সেই কিশোরী বয়স থেকে এই স্কুলে কাজ। বিয়ের পরও কাজে কামাই নেই। স্বামীর কামনার ডাককে উপেক্ষা করে স্কুলে পৌঁছেছেন প্রতিদিন। স্বামীর আদরের বদলে পেয়েছেন নির্যাতন, তবুও স্বামীর মৃত্যুতে তিনি কাতর। আধুনিক মানবীবিদ্যাচর্চার দৃষ্টিকোন থেকে অবশ্য এটা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু পুরুষের তৈরি করে দেওয়া নিয়মে তিনি নিজেকে ছাঁচে ফেলে গড়েছেন। তাই নির্যাতিতা হয়েও স্বামীকে তিনি স্মরণ করেন। প্রতিদিন ভোরে বেরিয়ে সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফেরেন স্কুল ছেড়ে। স্কুলের কলিংবেল হোক বা টেলিফোন সব দিকেই তাঁর নজর। কর্কশ ভাষার বকুনিতে তিনি নত দৃষ্টিতে চুপ থাকেন, উপরওয়ালাকে তিনি ধন্যবাদ দেন এই কাজ পাওয়ার জন্য। এতকিছুর মধ্যেও তিনি কখনো অসহায় বোধ করেন না। কিন্তু আজ চেয়ারে বসে তাঁকে ছবি তুলতে হয়েছে। ফটোগ্রাফার এবং স্কুলের অন্যান্যদের অনুরোধে তিনি তা অমান্য করতে পারেননি। এই যন্ত্রণা তাঁকে কুরে কুরে খাচ্ছে। কিন্তু ফটোগ্রাফারের কাছে যখন জানতে পারলেন এই ছবিতে চেয়ার নয়, এসেছে শুধু তার মুখটা; তখন অনস্বাদিত মুক্তির আনন্দে তাঁর মনটা নেচে উঠল। সরোজিনী আসলে সমাজের তৈরি করে দেয়া ছাঁচের মধ্যে নিজেকে গড়ে তুলেছেন। তাই নতুন করে ভাবনার অবকাশ তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। দাসত্ব তাঁর মজ্জায়-মজ্জায় কাজ করেছে। পাপ-পূণ্যবোধের দূরত্ব ও দৃষ্টান্ত তার কাছে মানসিক সমস্যা মাত্র। যদিও সে বোধ তার গড়ে ওঠেনি আর এখানেই গল্পের ট্রাজেডি।

> "স্ত্রীযোনির বিভিন্ন সময়ের অবস্থান বিবরণ প্রদান, সাগর সৈকত অথবা পশুক্ষুরের সঙ্গে তার তুলনা প্রভৃতি দ্বারা শিল্পরস তৈরি করা শুধু সেই লেখকের পক্ষেই সম্ভব, যার সমস্ত মন ও মনোযোগ যোনিঅনুগ। এ জাতীয় অলংকারে অলংকৃত রচনাকে শুধু সেই শ্রেণীর বিচারকরাই শিল্পোন্নত সাহিত্য বলতে পারেন, যাদের কাছে যৌনজীবন আর মানবজীবন একার্থক—অর্থাৎ যৌন জীবনের বাইরে মানব জীবন নেই।"[১৯]

আবু জাফর শামসুদ্দীনের আক্রমণের লক্ষ্য সেই সমস্ত লেখক-লেখিকারা, যাঁরা শুধুমাত্র শরীরকেই গল্পের বিষয়বস্তু করেছেন। কাহিনির প্রয়োজনে, মন-মেজাজের পরিবর্তনের প্রয়োজনে শরীরের অবস্থান বদল যে স্বাভাবিক, তা তিনি অস্বীকার করেন না। বাংলাদেশের সমাজ প্রধানত সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের। ইসলামের প্রাতিষ্ঠানিক রক্ষণশীলতা এবং স্থানীয় শাসন ব্যবস্থায় ইসলামের সমাজ-সংস্কৃতি-সাহিত্য যেভাবে প্রগতির ধারাকে ব্যাহত করেছিল, নারীর অবস্থানকে তা অধিকতর খর্ব ও গৌণ করেছিল। ইতিবাচক দিকের মধ্যে দেখা যায় ধর্ম প্রাবল্যগন্ধী সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিকৃতির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের সমাজে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল। নারী তার মতো করেই সেই প্রতিরোধের বাঁধ দিয়েছে।

> "পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দৃশ্য-অদৃশ্য অসংখ্য বেড়ার মধ্যে বন্দী নারীসমাজ তার মগজটাকেও পুরুষের উপনিবেশ হিসেবে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে। সেই অবস্থান থেকে নারী যে সমাজটা দেখতে পায়, তার বিবিধ বিষয় সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে উদ্বুদ্ধ বোধ করে, কেউ কেউ উচ্চকণ্ঠ হয়, অন্যেরা প্রকাশ করে অপেক্ষাকৃত শান্ত ভঙ্গিতে, এ থেকেই বোঝা যায় নারীরা তাদের— 'অবলা' ভূষণটিকে সঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করেছে।"[২০]

Reference :

১. হোসেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, 'স্ত্রীজাতীর অবনতি', 'ভাষা-পাঠ সঞ্চয়ন বাংলা'। প্রাক-স্নাতক ভাষা-পাঠ পর্ষৎ কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০২, পৃ. ৪২ - ৪৩

২. হোসেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত, 'বলিগর্ত', সম্পাদনাঃ বসু, পূরবী ও আহমেদ, শফি, 'বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প' অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ৫

৩. ইমাম, জাহানারা, 'অস্ত্র', তদেব, পৃ. ২৬

৪. ইমাম, জাহানারা, 'অস্ত্র', তদেব, পৃ. ২৮

৫. ইব্রাহিম, নীলিমা, 'রমনা পার্কে', তদেব, পৃ. ৩৩

৬. সামাদ, লায়লা, 'অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা', তদেব, পৃ. ৪৪

৭. হোসেন, সেলিনা, 'মতিজানের মেয়েরা', তদেব, পৃ. ৮৩

৮. হোসেন, সেলিনা, 'মতিজানের মেয়েরা', তদেব, পৃ. ৮৫

৯।হোসেন, সেলিনা, 'মতিজানের মেয়েরা', তদেব, পৃ. ৮৬

১০. হোসেন, সেলিনা, 'মতিজানের মেয়েরা', তদেব, পৃ. ৮৭

১১. আজাদ, হুমায়ুন, 'নারী', আগামী প্রকাশন, ঢাকা- ১১০০, তৃতীয় সংস্করণ বিংশ মুদ্রণঃ আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৩২

১২. নাসরিন, তসলিমা, 'মাতৃত্ব', সম্পাদনাঃ বসু, পূরবী ও আহমেদ, শফি, 'বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প' অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ১২৮

১৩. নাসরিন, তসলিমা, 'মাতৃত্ব', তদেব, পৃ. ১২৯

১৪. গুলশান আরা, জুবাইদা, 'একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা', তদেব, পৃ. ১৫৬

১৫. গুলশান আরা, জুবাইদা, 'একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা', তদেব, পৃ. ১৫৬

১৬. গুলশান আরা, জুবাইদা, 'একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা', তদেব, পৃ. ১৫৬

১৭. গুলশান আরা, জুবাইদা, 'একটি ইঁদুর ও কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রা', তদেব, পৃ. ১৫৯

১৮. শাহেদ, হোসনে আরা, 'সরোজিনীর ছবি', তদেব, পৃ. ১৬১

১৯. শামসুদ্দিন, আবু জাফর, 'স্বাধীনতাপূর্ব বাংলাদেশের গল্পসাহিত্য', সম্পাদনা: চৌধুরী, প্রণব, 'বাংলাদেশের সাহিত্যের আলোচনা পর্যালোচনা ও অন্যান্য প্রবন্ধ', জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা- ১১০০, ফেব্রুয়ারি, ২০০১, পৃ. ২৫৭

২০. সম্পাদনাঃ বসু, পূরবী ও আহমেদ, শফি, 'ভূমিকা', 'বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প' অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, বইমেলা, ১৯৯৬, পৃ. ক

Bibliography :

আকর গ্রন্থ :

সম্পাদনা, বসু, পূরবী ও আহমেদ, শফি, 'বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের গল্প' অনুষ্টুপ, কলকাতা-৯, বইমেলা, ১৯৯৬